উত্তরবঙ্গের জাতি ও জনজাতি

সম্পাদনা

রতন বিশ্বাস

পুনশ্চ

সূচিপত্র

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী : টোটো	বিমলেন্দু মজুমদার	২৫
কোচ-রাভা জনজাতি	সুনীল পাল	৪৮
গারো সমাজ ও সংস্কৃতি	বিমলেন্দু দাম	৬৪
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতি	রণজিৎ দেব	৭৫
উত্তরবঙ্গের ছয়টি পার্বত্য জনজাতি	অশোক গঙ্গোপাধ্যায়	৯১
দুই দিনাজপুর জেলার তফশিলি জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়	ধনঞ্জয় রায়	১১৮
লেপচা : পূর্ব হিমালয়ের এক অনন্য উপজাতি	নির্মল চক্রবর্তী	১৩৭
উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল জাতি	দুলাল দাস	১৪৮
নেওয়ার	রাজীব নন্দী	১৬৭
মালদহের একটি জাতি : চাঁই	সুনীলকুমার ওঝা	১৭৪
উত্তরবঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় জনজাতি : ধিমাল	মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র	১৮৫
উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভূমিপুত্রদের ভূমিকা	অশেষকুমার দাস	২২৭
মেচ বা বোড়ো জনজাতি—ধর্ম উৎসব সংস্কৃতি	বিদ্যুৎ রাজগুরু	২৪৩
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির ইতিবৃত্ত	দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী	২৫২
কোচ ও রাজবংশীয় জাতিতত্ত্ব	সত্যসুন্দর বসু	২৫৭
উত্তরবঙ্গে ডুকপা জনজাতির উৎপত্তি সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক অবস্থান	সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৩
উত্তরবঙ্গে ব্যাধ সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও তার বিবর্তন	অভিজিৎ দাশ	২৭৫
উত্তরবঙ্গে লুপ্তপ্রায় কোয়ালি সমাজ	উমেশ শর্মা	২৮৩
আমি ও আমার কোলজাতি	কার্তিকচন্দ্র বাআঁদা	২৮৯
উত্তরবঙ্গের জনজাতির পরিচয়	আবদুস সামাদ	২৯৫

কতিপয় প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি	প্রমোদ নাথ	৩১৬
মালদহ জেলার কতিপয় জনজাতি	সুলেখা সরকার	৩৩৫
উত্তরবঙ্গের কতিপয় জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	রতন বিশ্বাস	৩৬৩
পার্বত্যবঙ্গের অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	রতন বিশ্বাস	৩৭৭
আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনে রাউতিয়া জনগোষ্ঠী	চন্দন বাগচি	৪০৩
উত্তরের প্রাচীন ধুলিয়া জনগোষ্ঠী হারিয়ে গেছে	সুশীলকুমার রাভা	৪০৬
প্রসঙ্গ : গণেশ জনজাতি	আবদুস সামাদ	৪০৯
উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে লোকওষুধ	গৌতম চক্রবর্তী	৪১৩
উত্তরবঙ্গের উল্লেখ্য জাতি ও জনজাতি		৪৪৪
লেখক পরিচিতি		৪৪৭
পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের তালিকা		৪৫০
পশ্চিমবঙ্গের ৪০ টি আদিবাসীর ভাষা পরিচয়		৪৫১
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি		৪৫২
Select Bibliography (1)		৪৬০
Select Bibliography (2)		৪৭৪
References		৪৭৬

কিছু কথা

আদিবাসী শব্দটির সঙ্গে সকলের পরিচয় আছে। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি শ্রেণি ও সমাজের নতুন নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণত যাদের আদিম অধিবাসী (Aborigines) বলা হত, অধুনা সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় আদিবাসী তাদের বলা হয়।

ভারত এক বিশাল দেশ। সামগ্রিক জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ উপজাতির মানুষ। উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অসম এই সাতটি রাজ্যে উপজাতির সংখ্যা ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে অধিক। তবে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। পশ্চিমবঙ্গের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মোটা অংশ উত্তরবঙ্গে।

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জলবায়ু অনেকাংশে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা। উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল অবহেলিত ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ ছিল না। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই প্রত্যন্ত প্রদেশে নগণ্য ছিলেন। সেই কারণে যারা সুদীর্ঘ সময়ে এই অঞ্চলে মাটি কামড়ে থেকেছে, তারা সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূরে ছিল। এক একটা ভৌগোলিক ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা আচার ব্যবহারে, বিবাহ, ধর্ম, জন্ম-মৃত্যুর নানা সংস্কারে স্বতন্ত্র। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য অবশ্যই বেশি। একটি বিষয় সহজে চোখে পড়ে। একটি জেলা থেকে অন্য আর একটি জেলা ভৌগোলিক সীমানায় নির্ধারিত হয়। ভাষার ক্ষেত্রে সীমানা পরিমাপ করা যায় না। সেক্ষেত্রে ভাষা বহনকারীদের একটা পার্থক্য আস্তে আস্তে ধরা পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মালদহ জেলার মানুষের ভাষার সঙ্গে বিহার সীমান্ত মানুষের ভাষার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে পার্থক্য আরো দৃঢ়। উত্তরবঙ্গের জেলান্তরে তার দৃষ্টান্ত বহুল। উপজাতিরা ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোথাও কয়লাখনিতে, আবার কোথাও কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করছে। উত্তরবঙ্গে চা শিল্প বিশাল স্থান দখল করে আছে। ফলত তারা সেখানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। অন্যান্য সমতলভূমিতে

তারা কৃষিকর্মে নিয়োজিত। ব্রিটিশ আমল থেকে চা শিল্পপতিরা উপজাতি শ্রমিকদের উপর অন্যায়-অবিচার করে আসছেন। জোতদার, ধনিকশ্রেণী তাদের কম মজুরি দিয়েছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম করেছে। এই প্রসঙ্গে এই সংকলনে অনালোচিত চা শ্রমিকদের কিছু কথা তুলে ধরি। আসামের পর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম চা শিল্প গড়ে ওঠে। দার্জিলিং পাহাড়ে ১৮৪০ সালে চা শিল্প শুরু হলেও ১৮৫০ সালের আগে তা বাণিজ্যিক রূপ নেয়নি। দার্জিলিং জেলার সমতলে চা বাগান গড়ে ওঠে ১৮৬২ সালে, মতান্তরে ১৮৬৬ সালে। চা শিল্পে পাহাড়ের অধিবাসী এবং সমতলে সামান্য সংখ্যক নেপালি শ্রমিক বহাল ছিল। তবে ছোটোনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে শ্রমিক চা বাগানের মালিকরা এনেছিলেন। নেপাল থেকে অসংখ্য কৃষিজীবী মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ তাঁরা নিয়েছিলেন। শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হত। তারা বাগানের বাইরে যেতে পারত না। মালিকপক্ষের মুনাফার অঙ্ক মোটা ছিল। আর শ্রমিকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। অসমে চা বাগিচা শুরু হয় ১৮৩৯ সালে। শোষণ পদ্ধতি ও শ্রমিক সংগ্রহের ধরন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মতো ছিল। ১৮৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়, যাতে নীলকরদের অত্যাচারের বিচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫৯ সালে কিছু কিছু আইন সংশোধন করার পর নীলচাষ ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়। দেশব্যাপী ঘৃণা ও প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে নীলচাষ এ দেশে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। মনে রাখা দরকার যে, চা শ্রমিকরা বাগানে স্বেচ্ছায় যেত না বা তারা 'মুক্ত শ্রমিক' ছিল না। একটি চুক্তি জোর করে বা ছলেবলে কৌশলে স্বাক্ষর করিয়ে তাদের বাগানে নিয়ে যাওয়া হত। এই স্বাক্ষরিত চুক্তিতে জানানো হত যে, তারা স্বেচ্ছায় বাগানে কিছুদিনের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক। এই ধরনের চুক্তিপত্র থেকে ভারতবর্ষে একশ্রেণীর ক্রীতদাসের জন্ম হয়। এই শ্রমিকদের জীবিকা ভয়াবহ ছিল। ''ইউরোপীয়ান লেবার রিক্রুটিং এজেন্সি হাউসে'' এক বিশেষ ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করা হত, যাদের বলা হত 'আড়কাঠি।' এই আড়কাঠিরা গ্রামের প্রত্যন্ত দেশে পৌছে যেত এবং সৎ চাকুরি দানকারী বলে নিজেদের জাহির করত। তারা অতি কৌশলে নতুন শ্রমিককে বাগানে যেতে প্রলুব্ধ করত। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'চা কর দর্পণ' নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের মতো সাড়া ফেলেছিল। এইগুলি আসাম কেন্দ্রিক হলেও এই সংবাদ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে পৌছে যায়। এই কারণে—ব্রিটিশ সরকার ''ইমিগ্রেশান এ্যাক্ট'' সংশোধন করতে বাধ্য হন। চা বাগানের বাইরে চা শ্রমিকদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। শ্রমিকদের বেতন মজুরি প্রচলন এবং তাদের হাটে যেতে দেওয়াবও অনুমতি

মিলল। বিশ শতকের শুরুতে মাঝে মধ্যেই পাহাড়ে ও সমতলে চা বাগানগুলিতে "কুলি খ্যাপার" ঘটনা ঘটতে লাগল। নারী-শ্রমিকদের সম্ভ্রমহানির ঘটনাগুলি নিয়ে শ্রমিকরা ওই সময় খেপে গিয়েছিল। অত্যাচারী সাহেব খুন হত এবং এই দেশের তদারকি কর্মচারী মার খেত। ক্রমে ক্রমে বাগান জুড়ে বিদ্রোহ হত। শ্রমিকরা কলকারখানা ভাঙচুর এমন কী বড়ো ঘড়ি চুরমার করেছিল। শ্রমিক নির্যাতনের মূলে ছিল নারীশ্রমিককে ভোগ করার অজুহাত মাত্র। কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হলে পরিবার সমেত শ্রমিককে রাতের অন্ধকারে মারতে মারতে হপ্তাবাহার বা হটাবাহার করা হত। এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের মোটা অংশ বিতাড়িত হয়ে জঙ্গল কেটে জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। দেশের স্বাধীনতা ও নিজেদের মুক্তির কথা তারা বারবার চিন্তা করেছে। সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে সামিল হয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষকরা অধিকার সঞ্চার করেছে। জোতদারদের হাত থেকে জমি সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি চা শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি অনেক ক্ষেত্রে আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। শোষণজর্জর উপজাতিরা বোড়ো, ঝাড়খণ্ডি, কামতাপুরি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে উপজাতি জনগণের সমস্যাগুলি তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ও স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতীয় শাসকবৃন্দ খতিয়ে দেখেননি। তাদের গণতান্ত্রিক বিকাশ কীভাবে ঘটবে, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের মীমাংসা কীভাবে হবে, তার সঠিক পথ তারা খুঁজে পায়নি। সেকারণে কোনো কোনো সময়ে জাতি ও উপজাতীয় জনগণের সঙ্গে বিরোধ দেখা গেছে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ভূমি-সংস্কার এবং উন্নয়নমূলক কাজের দিকে নজর দিয়েছেন। ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে জমিদার ও জোতদারগণের বাড়তি জমি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকার ওই জমি গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলিবন্টন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপজাতীয় জনগণের ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘকাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে লক্ষ করা গেছে, উপজাতীয় জনজাতি সম্পর্কে সমুদয় বইপত্র এবং রচনা অধিকাংশ বিদেশিরা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ আমলা, মিশনারি এবং নৃতাত্ত্বিক আছেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে লিখেছেন। মূলত ব্রিটিশ সরকারকে আনুকূল্য প্রদর্শন করাই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সবই ইংরেজি ভাষায়। বাংলাভাষায় উপজাতীয় জনজাতি সম্পর্কিত গ্রন্থ সংখ্যায় নগণ্য।

মধুপর্ণীর সম্পাদক শ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। লোকশ্রুতি ও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা দুইটি উপজাতি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ

প্রকাশ করেছেন। বাংলাভাষায় অন্যান্য পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু আলোচনা দেখা গেছে। উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি নিয়ে একসঙ্গে কোনো কাজের হদিস পাওয়া যায়নি। মোট ১৮ টি বিশেষ প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পাঁচ বছর সময় লেগে গেছে। স্থানাভাবে অনেকগুলি উপজাতীয় মানুষের কথা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। আবার যাদের কথা এই সংকলনগ্রন্থে রাখা হয়েছে, তা অতি সংক্ষিপ্ত। সহৃদয় পাঠক এই বিষয়ে ক্ষমা করবেন। নেপালি জাতি সম্পর্কে একক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে নেই। সেক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বিধৃত। আলোচনায় তাঁদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুশাসনের ভিন্নতা ধরা পড়েছে।

এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধ তথ্যের ভিন্নতা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত।

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার ''পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী ঃ টো টো'' শীর্ষক প্রবন্ধে টোটোদের নৃতত্ত্ব শুধু নয়, সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক দিকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই জনজীবনের সঙ্গে বহুদিন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন।

''কোচ-রাভা জনজাতি'' প্রবন্ধের লেখক শ্রীসুনীল পাল। তিনি কোচ-রাভা সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিচিত। তিনি তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলি নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

উত্তরবঙ্গে গারোরা ছড়িয়ে আছে। কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অধিক সংখ্যক নেই। শ্রী বিমলেন্দু দাম ''গারো সমাজ ও সংস্কৃতি'' শীর্ষক প্রবন্ধে গারোদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির রূপ তুলে ধরেছেন।

সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ধারার রূপরেখা অতি সহজ ভাষায় শ্রীরনজিৎ দেব ''উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতি'' প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীঅশোক গঙ্গোপাধ্যায় ''উত্তরবঙ্গের সাতটি পার্বত্য জনজাতি'' শীর্ষক প্রবন্ধে পাহাড়ি জনজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখায় জনজীবনের পরিবর্তনের ধারা বর্ণিত। ''ধামী'' ও ''কামী'' সম্প্রদায় আধুনিক পাহাড়ি জীবনে ফিরে এলেও তারা সমাজে অচ্ছুত।

শ্রীধনঞ্জয় রায় ''পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তফশিলি জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিচয়'' এবং ''মালদহ জেলার জনগোষ্ঠী'' শীর্ষক দুইটি নিবন্ধে পাশাপাশি দুই বিশাল এলাকার জনগোষ্ঠীর পরিচয় দিয়েছেন। দুই জেলার জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তাঁর তথ্যসংগ্রহ বিষয়টি নিজস্বতায় ভাস্বর।

উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স জুড়ে চা বাগান। চা শিল্প শুধু এই বঙ্গের পরিচয় বহন করে না, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আদিবাসীদের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। এরা দীর্ঘকাল ধরে শোষিত ও নিপীড়িত। এদের সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও ভাষা মিশ্র প্রকৃতির। শ্রীদেবব্রত বসুর ''উত্তরবঙ্গের চা বাগিচার জনজাতি'' প্রবন্ধে তার বিশ্লেষণ।

শ্রীঅশেষকুমার দাস ''মেচ জনজাতি'' নিবন্ধে মেচদের অনালোচিত কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। এই সম্প্রদায়ের পরিবর্তিত জীবনচর্চার কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

লেপচা সম্প্রদায়ের কথা বহুল আলোচিত। এদের সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিতে নিবন্ধ লিখেছেন : শ্রীনির্মল চক্রবর্তী ''লেপচা : পূর্ব হিমালয়ের এক অনন্য উপজাতি।''

দক্ষিণবঙ্গে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসবাস অধিক। উত্তরবঙ্গেও ছড়িয়ে আছে সাঁওতালরা। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি শুধু নয়, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে উল্লেখ্য। শ্রীদুলাল দাস ''উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল জাতি'' নিবন্ধে সেই কথাই বলেছেন।

দার্জিলিং পাহাড়ের ''নেওয়ার'' সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ স্থান আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় রূপরেখা শ্রীরাজীব নন্দী ''নেওয়ার'' প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীসুনীলকুমার ওঝার ''মালদহের একটি জাতি ঃ চাঁই'' প্রবন্ধটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালদহ জেলার চাঁই জনজাতি সম্পর্কে আলোচনা সচরাচর চোখে পড়ে না।

প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি সব মানব সমাজেই আছে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি বংশপরম্পরায় প্রচলিত। তাদের লৌকিক ও অলৌকিক দেবদেবীর বিশ্বাস প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভেষজ ঔষধের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ''উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে লোকওষুধ'' নিবন্ধে আদিবাসীদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন।

আদিবাসীদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগ। ''ধিমাল'' সম্প্রদায় বিশেষ করে তরাই অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করেছিল। শুধু বাঘ, হাতি নয়, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর উপেক্ষা করে তারা এই অঞ্চলের আদিবাসী। এই বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র ''উত্তরবঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় জনজাতি : ধিমাল'' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

রতন বিশ্বাস ''উত্তরবঙ্গের কতিপয় জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়'' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৪টি জনজাতির অতি সংক্ষিপ্তভাবে বিশিষ্ট দিকের অবতারণা করেছেন। সেইসঙ্গে অনেকগুলি উপজাতির নাম উল্লেখ করেছেন। নৃতাত্ত্বিকরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করছেন। সারা বিশ্বের মানুষদের শারীরিক বলতে শরীরের মাপ, বিশেষত হাড় এবং নরকংকালের মাথার খুলি ও তার অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ তাঁরা করছেন। এই Anthropometric Data সংগ্রহ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা পশ্চিমবঙ্গে এখনো এগোয়নি।

স্বাধীনতার উত্তরকালে আদম সুমারির কাজ যথাযথ হয়নি। আদম সুমারি ১৯৯১ খুব একটা প্রাধান্য পায় না।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের নিয়ে একটা গবেষণা কেন্দ্র গঠন করা দরকার। এই কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত গবেষক এবং বহিরাগত গবেষক যাতে সুযোগ পান, তার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।

গ্রন্থ প্রকাশনার বিষয়ে শ্রীযুক্ত শঙ্করীভূষণ নায়ক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথা ভুলবার নয়। আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন বন্ধু প্রতিম শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ড. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র, শ্রী অশেষ দাস, শ্রী দুলাল দাস ও শ্রী মীমলাল সাপ-কোটা। এছাড়া অনেকে আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করি।

শিলিগুড়ি
২৮.৮.২০০০

রতন বিশ্বাস

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

পাঠক, শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক সকলেই 'উত্তরবঙ্গের জাতি উপজাতি' সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে প্রচলিত ছোটো-বড়ো সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রে যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে—সেগুলি গ্রন্থের অনুকূলে। অনেকে গ্রন্থটির পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কলকাতার পুনশ্চ প্রকাশনার কর্ণধার সন্দীপ নায়ক গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধ তুলে নেওয়া হল। আর এই সংস্করণে এগারোটি নতুন প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হল। প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে দু'চার কথা। 'বোড়ো জনজাতি—ধর্ম উৎসব সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বিদ্যুৎ রাজগুরু নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। ক্ষেত্র-সমীক্ষা-নির্ভর বলা যায়।

দীনেশচন্দ্র লাহিড়ীর 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির ইতিবৃত্ত' এবং সত্যসুন্দর বসুর 'কোচ ও রাজবংশীয় জাতিতত্ত্ব' দুটি মৌলিক প্রবন্ধ। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা।

'উত্তরবঙ্গে ডুকপা জনজাতির উৎপত্তি সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক অবস্থান' প্রবন্ধটি লিখেছেন সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবন্ধকার যথেষ্ট যত্ন সহকারে লেখাটি উপস্থাপন করেছেন। এ যাবৎ ডুকপাদের সম্পর্কে যে সকল লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে স্বতন্ত্র। তথ্যপূর্ণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা-নির্ভর। অভিজিৎ দাশের 'উত্তরবঙ্গে ব্যাধ সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও তার বিবর্তন' প্রবন্ধটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। লেখক ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন।

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা 'উত্তরবঙ্গে লুপ্তপ্রায় কোয়ালি সমাজ' প্রবন্ধে অবহেলিত কোয়ালিদের কথা তুলে ধরেছেন। কোয়ালি সমাজের কথা বিদ্বৎ সমাজে অনালোচিত।

'আমি ও আমার কোলজাতি' প্রবন্ধের লেখক কার্তিকচন্দ্র বাআঁদা। কোল সমাজ সম্পর্কে মুক্ত মনে আলোচনাটি তুলে ধরেছেন। তাঁর 'কোল ভাষার উৎস চারিত' গ্রন্থে কোল ভাষা ও লিপির বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চোখে পড়ে।

প্রথম সংস্করণে আলোচিত জনজাতিদের সঙ্গে আরও অনেকগুলি জনজাতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। এদের নিয়ে আলোচনা করেছেন (ভিন্ন ভিন্ন) প্রবন্ধে—আবদুস সামাদ, প্রমোদ নাথ, সুলেখা সরকার এবং রতন বিশ্বাস।

রতন বিশ্বাস

শিলিগুড়ি,
১৪২৬, দোলপূর্ণিমা

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী : টোটো

বিমলেন্দু মজুমদার

ভূমিকা :

জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট থানার ভাবত-ভুটান সীমান্তে অবস্থিত পাহাড়ি গ্রাম টোটোপাড়া। এই একটি মাত্র গ্রামেই বর্তমানে বসবাস করেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জনজাতি টোটো সম্প্রদায়। গ্রামটির ভৌগোলিক আয়তন ১৯৯১.৫৯ একর। ভুটান সীমান্তে তাডিং পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত এই গ্রামের উচ্চতা, ৫৫০ ফুট থেকে ২০২৪ ফুট। ভৌগোলিক অবস্থান ২৬°৫০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২০ দ্রাঘিমাংশে। খরস্রোতা পাহাড়ি ঝোরা, পাহাড় এবং দুর্গম অরণ্যে ঘেরা এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কয়েক দশক আগেও দেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

১৮১৫ খ্রিঃ তৎকালীন রংপুরের এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু প্রথম 'এ্যাকাউন্টস্ অব্ ভুটান' নামক প্রতিবেদনে টোটো জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেন। পরে সান্ডার্স সাহেবের জরিপ প্রতিবেদনে এবং পরবর্তী কিছু জনগণনা-প্রতিবেদনে এবং সরকারি নথিপত্রে ও কিছু কিছু প্রতিবেদন টোটোদের কথা প্রকাশিত হয়। তবে সেসব বিবরণ ছিল নিতান্তই প্রাথমিক এবং অপ্রতুল। অধ্যাপক বিক্রমকেশরী রায়বর্মন প্রথম টোটো জনজাতির উপর মূল্যবান গবেষণা করে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু বাইরের জগতের কাছে টোটো জনজাতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রথম তুলে ধরেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।

নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে টোটো জনজাতি টিবেটো-মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর একটি শাখা। মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর একটি শাখা হিসেবে টোটোদের শরীরের গঠন ওই জনগোষ্ঠীর সব লক্ষণই বিদ্যমান। তবে গাত্রবর্ণে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। তাঁদের গায়ের রং বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালো। যা এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো মধ্যবর্তী জনগোষ্ঠীর রক্তসংমিশ্রণের স্বাক্ষর বহন করে। টোটোদের শরীরের গঠন সুঠাম। চুল দৃঢ় ও সরল। দাড়ি গোঁফ বিরল। নাকের গঠন এবং চোখের পাতার গঠনে মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট লক্ষণ বর্তমান। ভুটিয়াদের মতো টোটো পুরুষরাও একসময় লম্বা চুল রাখতেন। বর্তমানে তা আর দেখা যায় না।

বর্তমান টোটোপাড়ায় টোটোরা আটপুরুষ ধরে বসবাস করছেন বলে তাঁদের বয়স্কদের অভিমত। তার আগে বর্তমান টোটোপাড়া থেকে প্রায় আট কিলোমিটার উত্তরে ভুটানের ডিয়াংছুতে বসবাস করতেন। কিন্তু কেন কীভাবে তাঁরা তাঁদের প্রাচীন বাসভূমি প্রত্যন্ত উত্তর ভুটানের য়াতুং উপত্যকা থেকে এখানে এসেছেন তা বলতে পারেন না। তবে বর্তমান ভুটানের প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো টোটোদের অন্তত দুটি বড়ো গ্রাম আছে বলে সাম্প্রতিক তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। কিন্তু সে সব টোটোদের সঙ্গে ভারতের টোটোপাড়ার টোটোদের কোনো যোগাযোগ নেই। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এদের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় বর্তমান টোটোপাড়া ছাড়াও এ জেলার আরো চারটি গ্রামে টোটোরা বসবাস করতেন। এই গ্রামগুলি হচ্ছে, তত্‌গাঁও (টট্‌গাঁও), তোতাপাড়া, তত্‌পাড়া ও তোতপাড়া। এই গ্রামগুলির নামের সঙ্গে টোটো বা তোতোদের নাম জড়িত। বয়স্ক টোটোদের উচ্চারণ থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে টোটো নামের সাবেক উচ্চারণ ছিল 'তোতা' বা 'তোতো'। কিন্তু রোমান বা ইংরাজি হরফের বানানের অসতর্ক উচ্চারণের ফলে বর্তমানে তা 'টোটো'তে (ToTo) পরিণত হয়েছে।

বর্তমান লেখকের অনুসন্ধানের ফলে, অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চলের অন্যান্য ভারবাহী জনগোষ্ঠীর (জল্‌দা, ডয়া, তন্ডু, খোনিয়া) মতো টোটোরাও ছিলেন ভুটানের ভারবাহী জনগোষ্ঠী বা ভুটানের 'জাপো' (দাস প্রজা)। ভারবহনের সূত্রেই টোটোরা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে গ্রাম স্থাপন করেছিলেন। আসলে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক এলাকার অধিকাংশ স্থানই ছিল এক সময় ভুটানের অধীন। সে সময় এই অঞ্চলে দুচারটি 'মাল্লি' (রংধামাল্লি, ভাঙ্গামাল্লি ইত্যাদি) বা সড়কপথ থাকলেও যানবাহন চলাচলের মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে পণ্যদ্রব্য বহনের জন্য 'বলদিয়া' ব্যবস্থা এবং 'রিলে ভারবাহী' প্রথাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ভুটিয়া 'জীনকাফ্‌' (রাজকর্মচারী) এবং 'ডোমে-পা' (টোটো উচ্চারণ) ধর্মগুরু বা ধর্মীয় রাজপুরুষদের যাতায়াতের পথে সাহায্য করবার জন্য 'ভারবাহী দাসপ্রথা' অনুসারে টোটোরা প্রায় সারা বছরই (বর্ষাকাল বাদে) 'হুইওয়া (হুইবা) বা বেগার ভারবহনের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এভাবে ভারবহনের জন্যই ভুটান-প্রশাসন বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক এলাকার ভারবাহী স্টেশন হিসেবে অন্তত চারটি গ্রামে টোটোদের বসতিস্থাপন করার ব্যবস্থা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থে। ফলে ভারত-ভুটান যুদ্ধের পর পরাজিত ভোট প্রশাসনের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এসব গ্রামে বসবাসকারী টোটোরা ভুটানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রস্থান করেন। কিন্তু একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বর্তমান টোটোরা তাঁদের গ্রামেই থেকে যান। কারণ প্রাক্‌জরিপ সীমান্ত চিহ্নিতকরণের সময় বর্তমান টোটোপাড়া ভুল করে ভুটানের সীমানার মধ্যে

অবস্থিত বলে চিহ্নিত হয়। এর ফলে এই গ্রামের টোটোদের গ্রাম পরিত্যাগের প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু পরে চূড়ান্তভাবে সীমান্ত চিহ্নিতকরণের সময় এই ভুল ধরা পড়ে এবং টোটোপাড়া গ্রাম ব্রিটিশ-ভারতের অঙ্গীভূত হয়। আর ততদিনে তৎকালীন ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে টোটোদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠায় টোটোরা চিরকালের মতো এই গ্রামেই থেকে যায়। এভাবে তাঁরা ভুটানের দাসপ্রজা থেকে মুক্তি লাভ করে ব্রিটিশের স্বাধীন প্রজায় পরিণত হন। তার পরের ইতিহাস তাঁদের অস্তিত্বের সংগ্রামের ইতিহাস।

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি :

নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও টোটো সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের ভাষার নাম 'টোটো' ভাষা। এটাকে ভাষা না বলে তিব্বত-বর্মী ভাষাবর্গের একটি উপভাষা বলা চলে। প্রখ্যাত ভাষাবিদ হজসন, গ্রিয়ারসন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'তিব্বত-বর্মি' ভাষা গোষ্ঠীর— 'Non-Pronominalised' বর্গের একটি ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের পরিসরে এই ভাষা অন্তত তিনটি পর্যায়ে বাংলা-নেপালি— ও বাংলাসহ বিভিন্ন অ-টোটো ভাষার সংস্পর্শে এসেছে। এর ফলে টোটো ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বিপুলসংখ্যক অ-টোটো ভাষার শব্দ স্থান করে নিয়েছে।

প্রাক্-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে হিমালয় সংলগ্ন বাংলার Linguafranca বা আন্তর্গোষ্ঠী যোগাযোগের ভাষা হিসেবে (আঞ্চলিক বাংলা সহ) বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল। এমনকি ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির (নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বত) সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের পত্রালাপ এবং চুক্তিপত্রের ভাষাও ছিল বাংলা। সেই কারণে ওই যুগে প্রতিনিধিস্থানীয় টোটোরা ও বাংলাভাষার মাধ্যমে পাহাড় ও সমতলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পরবর্তীকালে পার্বত্য-বাংলার প্রায় সর্বত্রই 'যোগাযোগের ভাষা' হিসেবে নেপালিভাষা প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে শীতের মরশুমে অনাবাসী নেপালি কমলালেবু বহনকারী শ্রমিকদের সঙ্গে জীবিকার সূত্রে টোটোদের যোগাযোগ ঘটে। সেই যোগাযোগের সূত্রে নেপালিরা টোটোদের সারল্যের সুযোগে এবং জেলাপ্রশাসনের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে টোটোদের জমিজমা দখল করে স্থায়ীভাবে টোটোপাড়ায় বসবাসের প্রয়াস পায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে। এর ফলে টোটো ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নেপালি ভাষা ও সংস্কৃতির সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত নেপালি ভাষা টোটোদের দ্বিতীয় ভাষায় পরিণত হয়।

বর্তমান টোটোপাড়ায় ভাষা-পরিস্থিতির পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। টোটোপাড়ায় বসবাসকারী নেপালি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যেও মনের ভাব আদান

প্রদানের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। টোটোপাড়ার বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং সরকারি কাজকর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কারণেই টোটোসম্প্রদায় সহ টোটোপাড়ায় বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাংলাভাষা শোনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টোটোদের মধ্যে বর্তমান শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত টোটোরা ছাড়া অনেক টোটোই এখন বাংলা বলতে বা লিখতে পারেন।

টোটোদের লোকসাহিত্যের উপাদান খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁদের কোনো হরফ বা লিখিত সাহিত্য-ভাণ্ডার নেই। অন্যান্য জনজাতির লোকসাহিত্যের মতো টোটো লোকসাহিত্যকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হচ্ছে—১. লোককথা, ২. লোকগীত ও ৩. মন্ত্র ইত্যাদি। টোটোদের লোককথার একটি অনুবাদ গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের নাগা লোকসঙ্গীতের মতো টোটোদের প্রাচীন লোকসঙ্গীতগুলি এবং 'লেতিগেছুয়া'দের (স্বপ্নদ্রষ্টাদের গান) গান অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এসব গানের অর্থ তারা সহজে বলতে পারে না। সে তুলনায় তাঁদের লোককথা ও মন্ত্রগুলি খুবই সহজবোধ্য। তাঁদের মন্ত্রগুলি লৌকিক দেবদেবতার পূজা এবং অপদেবতার সন্তুষ্টির জন্য খুব সহজ সরলভাবে রচিত। টোটো লোককথা এবং মন্ত্রগুলির মধ্যে যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ভোট প্রভাব অন্যদিকে বাংলার লোককথা ও লৌকিক মন্ত্রের প্রভাব পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টোটোদের পূজাপার্বণ এবং প্রায়শ্চিত্ত তাঁদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কারণ পূজা পার্বণের উপচার সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁদের ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে হয়। আর সেই সুযোগে স্থানীয় মহাজনরা বেশ দুপয়সা রোজগার করে নেয়। রোগশোক নানা বিষয়ে উঠতে বসতে তাঁর কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। আর আচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়ে টোটো (খুব কম) এবং নেপালি 'ঝাকড়ি' বা ওঝারা অবাধে শোষণ চালিয়ে যায়।

বর্তমানে টোটোদের লোককথা ও লোকসঙ্গীত প্রায় অবলুপ্তির পথে। যা কিছু টিকে আছে, তা ধর্মাচরণের সূত্রেই টিকে আছে। আসলে টোটো লোকসঙ্গীত একদিকে যেমন বর্তমান বংশধরদের কাছে দুর্বোধ্য, তেমনি জনপ্রিয়ও নয়। তাছাড়া আগেকার মতো এসব লোকসঙ্গীত চর্চার অবকাশ বা প্রচলনও নেই। ফলে লোক থেকে লোকের মুখে মুখে যে লোকসঙ্গীতের যাত্রা, তা টোটোদের মধ্যে যেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। ভিডিও, টি.ভি, রেডিওর মাধ্যমে তাঁদের নিত্যদিনের মনোরঞ্জনের অভ্যাসে অনায়াসে স্থান করে নিচ্ছে নেপালি লোকসঙ্গীত বা সঙ্গীত। নেপালি সঙ্গীত সঙ্গতের প্রভাব তাঁদের সংস্কৃতিতে গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে। এমনকি নেপালিদের অনুসরণে টোটোরা এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইক ও নেপালি সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন করছে।

অথচ টোটোদের বিবাহ অনুষ্ঠানে নাচগান বা বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ কোনো ব্যবহার কোনোকালেই ছিল না। তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ওমছু এবং ময়ূরপূজা ছাড়া অন্যসময় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিষেধ আছে।

পোশাক পরিচ্ছদ :

টোটোদের চিরাচরিত পোশাকের সঙ্গে ভুটিয়াদের পোশাকের মিল আছে। তবে ভুটিয়াদের পোশাকের তুলনায় টোটোদের পোশাক খুবই সাদাসিধে এবং আদিম। দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে এই যে ভুটিয়াদের পোশাকের মতো টোটোদের পোশাকের কোনো সেলাই নেই, আবার হাত ঢাকার ব্যবস্থাও নেই। টোটোদের পোশাক কাঠ বা বাঁশের সরুফালির (পিনের মতো) সাহায্যে আড়াআড়িভাবে কাঁধের উপর আটকানো থাকে। টোটো মহিলাদের কোমরে, বুকে এবং মাথায় চার টুকরো কাপড় থাকে। এই পোশাকগুলিকে যথাক্রমে মেরা (কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকে), বিজি (কোমরে বেল্টের মতো বাঁধা—এতে পকেটের মতো থাকে)। তুম্‌বা (বক্ষবন্ধনী) এবং পারি (সাধারণতঃ বিবাহিতা মহিলারা ব্যবহার করেন)। টোটো মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের চিরায়ত পোশাকের রং সাদা। একসময়ে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উৎপাদিত বা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তুলো থেকে নিজেদের কাপড় তৈরি করতেন।

পুরুষরা তিন টুকরো কাপড় ব্যবহার করেন। তাঁরা ৬ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া এক টুকরো কাপড় ঘাড়ের উপর দিয়ে বাঁশের পিনের সাহায্যে আড়াআড়িভাবে পরেন। এই কাপড়টি ভুটিয়া পোশাকের মতো সারা শরীর এবং হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঢাকা থাকে। একে বলা হয় 'গাদো' বা 'বাওহা'। এর উপর তাঁরা একটুকরো কাপড় কোমরবন্ধের মতো জড়িয়ে রাখেন। এর ফলে বুকের কাছে একটা পকেটের মতো জায়গা তৈরি হয়। তাতে পান সুপুরি রাখা হয়। সামগ্রিকভাবে টোটো পোশাককে বলা হয় 'আংদুং'।

অন্যান্য জনজাতির মতো টোটোরাও অলংকার পরতে ভালোবাসেন, মহিলারা কান, গলায় ও হাতে অলংকার ব্যবহার করেন। চুড়ি বা বালা জাতীয় অলংকারকে বলা হয় ইরিংবা জীবিং। গলার হারকে বলা হয়— 'তি-সে' এবং কানের দুল জাতীয় ও আংটি জাতীয় অলংকারকে যথাক্রমে-নারসি/নিবা এবং কেয়ই বলা হয়। আগে টোটো মহিলারা কানে গলায় এবং হাতের আঙুলে মুদ্রার অলংকার ব্যবহার করতেন। আজকাল আর তা দেখা যায় না।

দু দশক আগে টোটো পুরুষেরাও একহাতে বালা জাতীয় কাঁসা বা পেতলের ভারী অলংকার ব্যবহার করতেন। এখন পুরুষরা আংটি ছাড়া আর কোনো অলংকার পরেন না। টোটোদের মধ্যে বর্তমানে সামগ্রিকভাবে অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। যেমন এসেছে তাঁদের বর্তমান নিকটতম প্রতিবেশী নেপালি ও বাঙালিদের